Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501008 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

'Chouthupir Charyapada': Emerging from Darkness into Light to Unravel the Mystery
চৌথূপীর চর্যাপদ: রহস্যের উন্মোচনে অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা

Papiya Nandi
Researcher
Bengali Department
Visva-Bharati

Received on: 06th February 2026
Accepted on: 22nd March 2026

Abstract:
Standing in the twenty-first century, this narrative seeks to manifest the modern through the touch of the medieval past. Two women — Bimala and Yojanagandha — have transcended the tribulations of their lives to forge ahead in search of the new and the light. While unearthing the past of an ancient 'Charyakar' (mystic poet), a new talent comes to light. Concurrently, Yojanagandha aspired to rescue Bimala from the dark, isolated existence of the mountains and establish her firmly within mainstream society. To this end, various individuals enter the scene, most notably Hafiz and a Buddhist Lama. It is a tale of establishing a life, interwoven with extraordinary mystery and intrigue — a story of emerging from the dark alleys of society into the luminous currents of the mainstream. To reintegrate a mountain girl into the primary flow of life, a character named Gandhakali is introduced — a persona behind which a hidden talent lies dormant. The objective of a woman battling cancer in the present day — known as Yojanagandha — is to unearth this talent from the very heart of the mountains. Throughout the novel, Yojanagandha's singular mission appears to be to utilize this persona of Gandhakali as a conduit to reveal the hidden talent of Bimala — the mountain girl — to the entire world. Fundamentally, this can be described as a narrative exploration that, while anchored in the present, employs the past as a medium to bring to light a talent that lies concealed within the present itself.

Key Words:
Mystery and Thriller, Charyapada, Buddhism, Exploration, Life, Anguish, Past and Present.

মূল প্রবন্ধ

জীবন? জীবন মানে সে তো এক আলো অন্ধকারে মোড়া নতুন পুরানো ঘটনার ঘনঘটা। আবার যদি তা হয় অন্বেষণের বীজ মন্ত্র তাহলে তো কথাই নেই। অন্বেষণ মানে শুধুই যে জীবন খোঁজা তা নয়। জীবনকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্যও প্রতিভারও খোঁজ। তাই আমরা বলতেই পারি, অন্বেষণ মানে শুধুই খোঁজ নয় তারও গভীরে আছে আবিষ্কার। তাকে অনেক বাধা ঝঞ্ঝাট পার হয়ে খাড়াই পথ অতিক্রম করে নিজেকে প্রকাশ করতে হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি সাহায্য করে এক নতুন তথ্য, নতুন প্রতিভা, সম্পদ আবিষ্কারে। অর্থাৎ এই আবিষ্কারের পথটাই হলো অন্বেষণ। এই যাত্রার অভিজ্ঞতা তিক্ত মধুর আবার বেদনাদায়কও হতে পারে,

© Santiniketan Sahityapath

হতে পারে নিষ্ফল। যারা নিরন্তর খুঁজে চলে, বাইরের ভেতরের দুই স্থানেই তারা হয়তো এই আবিষ্কারের আনন্দটুকু গ্রহণে অতীব আকাঙ্ক্ষী। আর তা যদি জীবনকে নিয়ে ইতিহাসকে নিয়ে হয় তাহলে তো সেখানে রোমাঞ্চের সীমা থাকে না। রোমাঞ্চের কাছে শত বাধাও তুচ্ছ হয়ে যায় এবং সেই ইতিহাস জীবন যদি অন্বেষণকারীর মনের তাগিদের সঙ্গে মেলে তখন তা অফুরান হয়ে ওঠে আনন্দিত আবেগে। তবে সে আবেগ এবং আনন্দ মনের তাগিদের পূরণে অনেকটা দিশা দেয়, পথ হারাতে দেয় না।

প্রীতম বসুর 'চৌথূপীর চর্যাপদ' উপন্যাসটি এমনি এক আবিষ্কারের অন্বেষণের গল্প। সেই গল্পকে যথাযথ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে ঔপন্যাসিক তৎপর থেকেছেন এবং উপন্যাস শেষ হয়েছে প্রতিষ্ঠের সীমানায় শেষ ঘণ্টা বাজিয়ে। যোজনগন্ধা নামক এক নারী গন্ধকালী নামক এক প্রাচীন চর্যাকারের জীবন ইতিহাস উদ্ধারের আশায় বেরিয়ে পড়ে পথে। একমাত্র দিশা খবরের কাগজে ছাপা এক সংবাদ,

"নিসিঅ উদ্ধমেরুত ণিচল পেখই
পরিমাণহ থাব গন্ধকালী ভণই"[১]

এই চর্যা লাইন দেখামাত্রই এক লহমায় সম্বিত ফিরে আসে। শরীরের কর্কট ব্যাধির যন্ত্রণাকেও যেন ঠাণ্ডা বরফের কুচির মতো নিষ্পন্দ করে দেয়। মনে চেপে বসে এক উত্তেজনা। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত লালিত পালিত হওয়া বাসনা। তার বশে যোজনগন্ধা চেপে বসে প্লেনের এক কোণে। মনে তখন প্রচণ্ড চাপা উচাটন। বাগডোগরা এয়ারপোর্টে নেমে গন্ধকালীর জীবনের ইতিহাসের মূল সূত্র যেখানে লুকিয়ে আছে সেই চৌথূপীতে এসে হতাশার অন্ধকার যোজনগন্ধাকে গ্রাস করলেও পরক্ষণেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ নলিনী রক্ষিতের সম্ভাষণে সে অন্ধকার আলোময় হয়ে ওঠে। এবার শুরু হয় কাহিনির গ্রন্থি বন্ধন ও গ্রন্থি মোচনপর্ব। এর সূচনা হয় নলিনী রক্ষিতের দেওয়া এক পুঁথি থেকে। সেই পুঁথি থেকে গন্ধকালীর জীবনের কাহিনি যেমন যোজনগন্ধা জানতে পারে তেমনি এক পাহাড়ি ছেলে মেয়ের জীবনের মায়াময়তার বন্ধনে বদ্ধ হয়ে দেখে তার ভেতরের এক অন্য রূপ। আসলে আমাদের মনে হয় গন্ধকালী নামক চরিত্রটি কল্পিত চরিত্র। পাহাড়ের গাত্রে গাত্রে কত প্রতিভা লুকিয়ে থাকে। সেই সব প্রতিভাসম্পন্ন নারীদের খুঁজে বার করাই তার লক্ষ যা গন্ধকালীর আড়ালে উঁকি দেয়। সহজে তো তাকে হাতে পাওয়া যাবে না। গন্ধকালী নামক এই চর্যাকারের জীবনকে খুঁজে বার করার মাধ্যমে যোজনগন্ধা যেন চেয়েছে সমাজের মূল সুর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মানুষের জীবনকে সমাজে ফিরিয়ে আনতে। আর এই কারণে হয়তো হাজার ঝঞ্ঝাট বিপদ তাকে পার করতে হয়েছে। পাহাড়ি ঝরনার কাঁচের মতো স্বচ্ছ বারিধারার অনন্তর প্রবাহ শরীরকে শীতল করলেও মনের খেদ শীতল করেনি। গন্তব্যের স্থানে পৌঁছে তার অন্বেষণ কিছুটা শ্লথ হয়েছে। নাগরিক জীবনে ক্রীড়ানত্বের মধ্য দিয়ে যেন গন্ধকালীর জীবনের নতুনত্ব শুরু।

২

ইতিহাসের ইতিকথা

"চৌথূপীর চর্যাপদ"নামটা শুনেই মনে হতে পারে, এ আবার কেমন চর্যাপদ কিংবা মনে হতে পারে চৌথূপী নামে কোনো এক চর্যাকারের লেখা পদ বা কবিতা। কিন্তু অন্দরমহলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে চমকে দেবার জন্য আছে নানা উপকরণ যা একই সঙ্গে রোমাঞ্চকর ও বেদনাদায়ক যন্ত্রণাদায়ক। অ্যাডভেঞ্চার যেন শেষ হলো এক অনির্বচনীয় পরিণতিতে। চৌথূপী আসলে কাহিনি অনুযায়ী একটি ছোটো মফস্বল শহর যা শিলিগুড়িতে অবস্থিত। এই চৌথূপীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক নারীর জীবন ইতিহাস।

আমরা জানি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজ দরবার থেকে এক পুঁথি পান, যা 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' নামে পরিচিত যাকে আমরা আরো সহজ করে চিনি চর্যাপদ নামে। যেখানে প্রায় ৫০টি পদ আছে। এর মধ্যে জীবনের গান সমাজের গানের অন্তহীন সম্পর্কের কথা পাই যা চর্যাপদ নামক বইতে গৃহীত আছে। চর্যা মানে জীবনের আচরণের পদ বা রচনা যা মানুষের কথা বলে, কথা বলে মানব সমাজের প্রাচীনতার। এই পঞ্চাশটি পদের থেকে সাড়ে ৪৬টি আবিষ্কৃত হয়েছিল। বাকিগুলি আজো পাওয়া যায়নি। লুইপা, ভুসুকু পা, কাহ্ন পা, সরহ পা এবং আরো অনেকে চর্যাপদ রচনা করেছেন। সেই সময়ের কাহিনিকে অবলম্বন করে গ্রথিত হয়েছে চৌথূপীর চর্যাপদ যা গন্ধকালী নামে এক চর্যাকারের জীবন বৃত্তান্তের ইতিহাস রোমন্থন। পুঁথি পেয়ে সমকালীন সমাজ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর জীবনের কিছু রোমাঞ্চকর কাহিনিতে সেজে উঠেছে এই উপন্যাস।

আমরা যে চর্যাপদ গ্রন্থ পড়েছি তাতে চর্যাকারেরা সেই সময়ের জীবন চর্যা, তাঁদের সাধনা পদ্ধতির কথা, সাধারণ সামাজিক মানুষের জীবনের কথা বাক্যের, শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। যা বুঝতে গেলে আমাদের পাড়ি দিতে হবে চেতনার বোধের দ্বীপান্তরে। যেখান থেকে কুড়িয়ে আনতে হবে সুন্দর সুন্দর বৌদ্ধিক ভাবনা যা জীবন বদলে দিতে পারে এক লহমায়। মানুষের চিন্তার অনেকখানি পরিবর্তন আনতে পারে সেখানে ষড়রিপু দমন থেকে ঈড়া পিঙ্গালা নারীর মধ্য দিয়ে সাধনার ষটচক্রকে অতিক্রম করে জীবন নামক নদীকে শেষ স্তরে নিবন্ধ করে অবান্তর জীবন পথকে সামনে দেখতে পাই। চর্যাপদের প্রথম পদেই বলা হয়েছে শরীরের পঞ্চভূতেনামক নদীকে শেষ স্তরে নিবন্ধ করে অবান্তর জীবন পথকে সামনে দেখতে পাই। চর্যাপদের প্রথম পদেই বলা হয়েছে শরীরের পঞ্চভূতের কথা বাহ্যিক এক পাখির রূপকের সাহায্যে —

"কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল
চঞ্চল চী এ পইঠা কাল
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমান"[২]

নানা তাত্ত্বিক বিষয়ের পাশাপাশি সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের ব্যাখ্যা জীবনের নানা চর্যাকে কাব্যাকারে ফুটিয়ে তোলে। চর্যাকারদের জীবনী তুলে ধরা কাজ নয়, জীবনের নানা সমস্যা, বোধের জ্ঞানকে প্রকাশ করায় তাদের কাজ। সময়কালের দিক দিয়ে কে কোন্ সময়ের কবি তা হয়তো ঐতিহাসিকরা নানা দিক বিচার করে বলেছেন। তবে এই কথা স্বীকার্য যে তাদের পদ মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত ঘরের সমাজের ছবিকে দেখিয়েছে। কোনো বিলাস শোভা পায়নি। তার পেছনে অবশ্য অন্য এক গভীর তাত্ত্বিক ও বৌদ্ধিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। আসলে চর্যাকারেরা যেভাবে কবিতার ছলে মানুষের জীবনকে দেখিয়েছেন তেমনভাবেই যোজনগন্ধাও চেয়েছে। তাই তাকে অনেক কৃচ্ছসাধন করতে হয়েছে।

ধান ভাঙতে শিবের গীত গাওয়ার মতো অনেকখানি গৌরচন্দ্রিকা করলাম আমরা। যেহেতু চর্যাপদ বিষয়কে নিয়ে কাহিনি গ্রন্থন তাই মূল চর্যাপদকে জানাটা আমাদের জন্য খুব জরুরী। উপমা রূপকের বর্ণনাতে তাৎপর্যময় দিক পুরো চর্যাপদকে ঢেকে রেখেছে ঠিক তেমনি ভাবে চৌথূপীর চর্যাপদও লেখক কল্পনার আবডালে দুই নারীর অসহনীয় জীবন যন্ত্রণাকে অলংকৃত করেছেন ভাষার সৌন্দর্যে সুললিত ভাষ্যে। আপনার প্রকাশ যেন আপনাকেই মুগ্ধ করে এগিয়ে চলেছে রহস্য উন্মোচন করতে করতে।

৩

নতুন ভূখণ্ডের সংকট

যোজনগন্ধা গন্ধকালীর কালের প্রতিনিয়ত যাত্রা শুরু করে কিন্তু এক নব সংকটের সম্মুখ দিয়ে। যেখানে অপেক্ষা করছে অজানা রহস্যময় স্থানে অতিথি আপ্যায়ন। সেই সঙ্গে এক বিপ্রতীপতার উদ্ঘাটন। নতুন আবিষ্কারের আনন্দ। গন্ধকালী নামক চর্যাকারের আড়ালে সামাজিক এক পাহাড়িয়া নারীর জীবনান্বেষণ। মিউজিয়াম থেকে পুলিশি পাহাড়ায় স্টেশনের পথে যেতে যেতে অপহৃত হয় হাফি ও যোজনগন্ধা এক দুর্বৃত্তের দ্বারা। সাত দিনের নজরবন্দীতে মুক্তির দীর্ঘশ্বাসের মতো তাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস দেয়নি। নলিনী রক্ষিতের দেওয়া গন্ধকালীর পুঁথি এক অন্য মুক্তি দেয়। শুরু হয় নতুন মন-ভূখণ্ডের মৃত্তিকা খনন।

নদীর পাড়ে যেমন প্রথম মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল গড়ে উঠেছিল মানুষের জনবসতি সমাজ ঠিক তেমনভাবেই গন্ধকালীর নতুন জীবনের শুরু হয়েছিল এই নদীর পাড়ে গুরু শ্রীধরকে উদ্ধারের মধ্য দিয়ে, "গন্ধকালীর চোখ গেল নদীর ধারে জলের পাড়ে কোমর ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বনঝামা, বাজবরন, আশশ্যাওড়া, লঙ্কাসিরের জঙ্গালে। জলে ভেসে এসে আটকে আছে একটা মানুষ, মানুষটার মুখ কাদায় গেঁথে গেছে।"[৩]

শ্রীধর হলো বিক্রমশীল মহাবিহারের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তুরস্কদের আক্রমণের ফলে বিহার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলে জীবনের তাড়নায় জীবনকে বাঁচাতে পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে এসে উপস্থিত হয় গন্ধকালীর গ্রাম তাল পাটকে। গ্রামের পাঠশালার দায়িত্ব নেয়। গন্ধকালীর বাড়িতে থাকতে থাকতে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্মৃতির পরিচয় পেয়ে তাকে শিক্ষা দেয়। এখানেই শুরু বিপন্নতা। পিশাচ-বিয়ে হওয়া এক নারীকে শিক্ষাদানে গ্রামমুখ্যরা বিরূপ হয়। এতে অবশ্য শিক্ষাদান বন্ধ হয়নি। সামাজিক বাধা পার করেও শ্রীধর গন্ধকালীকে শিক্ষা

দিয়েছে। ফলে সে হয়ে উঠেছে সঞ্জিবনী চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞানী। তা সত্ত্বেও আরো জ্ঞান লাভের জন্য গন্ধকালীকে শ্রীধর চৌথূপী সঙ্ঘারামে যেতে বলে। কিন্তু পথ অতীব কঠিন। পথসঙ্গী গোপা ও দিবাকরের বাড়িতে আশ্রয় পেলেও বৌধ্য বজ্রযান সাধনা পদ্ধতির পথে বলিহতে হতে বেঁচে যায়। আবার আশ্রয়হীন নতুন পথ। এইভাবে জীবনের তাড়া খেতে খেতে অসম্ভব সহ্যশীল হয়ে ওঠে সে। হাফি ও যোজনগন্ধাকে পাহাড়ের গুহায় আটকে রাখলে বিমলা নামে এক পাহাড়ি মেয়ের দেখা মিলে। তার স্বপ্ন তিরন্দাজ হওয়া। মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে চায়। গন্ধকালী ও বিমলা দুই নারীই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। দুজনের জীবনেই দূত হয়ে এসেছে দুজন বৌদ্ধ ভিক্ষু লামা ও শ্রীধর। কিন্তু নিজের নিজের লক্ষে পৌঁছানো নিজেদের দায়িত্ব। শত বাধা কষ্ট, যন্ত্রণা, বিপদ, একাকিত্বকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে।

কলকাতার সচ্ছল বিলাসবহুল জীবন থেকে বেরিয়ে যোজনগন্ধাকে পাহাড়ের কোলে কোলে ফিরতে হয়। সেটা হয়তো জীবনকে টিকিয়ে রাখারই কারণে। তাই সমস্ত ভালো-খারাপ পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিয়ে চলেছে। অতীত খুঁড়তে গিয়ে সামনে আসে ভাবীকালের এক নারীর স্বপ্ন পূরণের তাগিদ। পারিপার্শ্বিক লোকের হাত থেকে নিজেকে নিজের স্বপ্নকে মাঝে মাঝে মনে পড়িয়ে দেয় সেই হরিণীর কথা। যে নিজেকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়ে দৌড়ে বেরিয়েছে বন থেকে বনান্তরে —

“ভোর;
সারারাত চিতা বাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে
অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে
সুন্দর বাদামি হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল।”[৪]

এ জঙ্গাল থেকে ও জঙ্গাল ঘুরে বেরিয়েও শেষ পর্যন্ত হরিণটি নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি দুর্বৃত্ত মানব শ্রেণির হাত থেকে। ভোরের মনোরম কোমল স্নিগ্ধতা তাকে ঢেকে দিল মৃত্যুর কালো অন্ধকারে। যোজনগন্ধা, মাফিয়া মামা, কর্কট ব্যাধি পাহাড়ি পরিবেশে স্থান থেকে স্থানান্তরে দৌড়ে বেরিয়েছে ম্রিয়মান এক হরিণীরই মতো। তফাৎ শুধু সে নিজেকে মৃত্যুর ফাঁদে পা দেওয়া থেকে বাঁচিয়েছে যা হরিণীটি পারেনি। আসলে মানুষ তো বুদ্ধিমান প্রাণী। সে নিজেদের পরিবেশ অনুযায়ী মানানসই করে নেয়। হরিণীটি সেখানে ব্যর্থ। মানুষের সীমানার কাছে অবলা প্রাণীর সমস্ত জারিজুরি থেমে যায়। সেখানে দয়াধর্মহীন যোজনগন্ধা ক্যান্সারে আক্রান্ত জেনেও সামান্য টাকার লোভে মাফিয়া দল তাকে আটকে রাখতে পিছপা হয়নি।

৪

কালের কালান্তর

অতীত এবং বর্তমানকে একই সূত্রে গ্রন্থন করতে করতে এগিয়ে চলেছে গ্রন্থিমোচন পর্ব। তা শেষ হয়েছে দুই নারীর প্রতিষ্ঠার শেষ বিন্দুতে এসে। শূন্যতা নয় হাসি খুশি ভরা সচ্ছল জীবন তাদের পরিপুষ্টি দান করেছে। একদিকে বিমলা অন্যদিকে গন্ধকালী দুইজন দুটি সময়ের ধারক যার সেতুবন্ধন করেছে যোজনগন্ধা। নাট্যকার এবং প্রযোজক একই ব্যক্তি, শুধু সময়ের ব্যবধান কয়েক যুগের কিন্তু অসম্ভব মিল দুইজনের মধ্যে। দুজনেই চায় লক্ষ্যে পৌঁছতে। পাহাড়ে সরল সাদা সিধা এক মেয়ে বিমলা, যে পেটের দায়ে দেশদ্রোহী হয়ে উঠেছে। অর্জুন বিমলা ভানু এদের সবাইকে মাফিয়া মামা খাবারের লোভে খারাপ কাজে ব্যবহার করে যেখানে স্বপ্নবাসনা বিলাস। অনেক মানুষকে অপহরণ খুন রাহাজানি চুরি ডাকাতি করে জীবন চালাতে হয় তাদের আর সেই পয়সায় নিজের বা নিজেদের দুটো পেটের ভাত জোটে। পাহাড়ের অন্ধকার রাস্তায় যেন তাদের জীবনটা অন্ধকারময় হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই চোরাকুঠুরিতে মশালের এক টুকরো শুভ্র আলো হাতে পট্টবস্ত্র পরিহিত হয়ে আসে যোজনগন্ধা ও লামা। অন্যদিকে তালপাটক নামক এক গ্রামের পরিবেশ থেকে নদী-নালা মাঠ ঘাট পার হয়ে এসে উপস্থিত হলেও পথে মানুষের কামুক প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ফেরে। জলপথে মুসলমান সৈনিকরা স্থলপথে কামাতুর পুরুষের চোখ। বোধি চিত্তের আসনে মনকে স্থবির করলেও চোখ যেন নারী মাংসের প্রতি লোলুপিত হয়ে ওঠে।

 © Santiniketan Sahityapath

"গুরুদেব চেঁচিয়ে তার সঙ্গো সঙ্গামরতা নারীকে দেখিয়ে বললেন — 'এ নারীর আকর্ষণ আমি জয় করেছি। একে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যা!' তারপর গন্ধকারীকে দেখে বললেন, 'কে এই কন্যা? এ আমার চমন-ধমনের মধ্যে অবধূতিকায় জোয়ারের টান এনেছে। একে এখানে বিবস্ত্র করে নিয়ে আয়। আমার বোধিচিত্ত ঊর্ধগা করে উষ্ণীষ কমলে স্থির করে মহাসুখ লাভ করব'।"[৫]

বজ্রযান সাধকেরা নারী সঙ্গ লাভের মধ্য দিয়ে কামকে জয় করতে চেয়েছিল যা বৌদ্ধ ভাবনার তথা বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ। তাঁরা নির্বাণ লাভের কথা বলেছিলেন যা সৎ হতে হবে, হতে হবে নৈতিক গুণাবলি সম্পন্ন। সকলেই নির্বাণের কথা বললেও বৌদ্ধ ধর্ম মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল। তাঁরা বলতেন সৎকর্ম, সৎ বাক্য, সৎ চেষ্টা, সৎ জীবিকা, সৎ চিন্তা সৎ দৃষ্টি সৎসংকল্প সৎ সমাধি নৈতিক গুণাবলির কথা বলেছিলেন যা পরবর্তীকালে অন্য মাত্রা লাভ করে। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম বিনষ্টের পথে যেতে থাকে। এর ফলে তাদের যে নির্বাণ লাভের চিন্তা, আদর্শ — তার অনেকখানি পরিবর্তন ঘটে যায়।

শ্রীধর যেমন গন্ধকালীকে পথের আশঙ্কা সত্ত্বেও ভবিষ্যতের দিকে যাত্রায় অনুপ্রাণিত করেছিল পথ দেখিয়েছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই যোজনগন্ধা ও বৌদ্ধ লামা বিমলা, অর্জুনের তীর ধনুক চালানোর স্বপ্নকে পূরণ করতে সহায়তা করেছিল। লামা এক বৌদ্ধ সাধক পুরুষ। তেজস্বী, স্থিতধি পুরুষ যাকে দেখলেই স্বাভাবিকভাবেই মাথা নত করতে ইচ্ছে জাগে। লামা বিমলা ও অর্জুনকে তীরধনুক শেখানোর প্রশিক্ষণ দেয় যাতে করে তারা সামাজিক স্রোতে ফিরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে মানুষের সামনে। ভালোভাবে বাঁচতে পারে। বাঁচাতে পারে তাদের তিল তিল করে গড়ে তোলা মায়েদের স্বপ্নকে। জীবনে পালিয়ে যাওয়াটায় শেষ কথা নয় এই সত্যকে সামনে নিয়েই এগিয়ে যায় তারা। সমস্ত খারাপ সময়কে পার করে যখন তারা কলকাতার মতো এক বড়ো শহরের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত এবং বিমলা একজন তীরন্দাজ হিসেবে সফল নারী সেখানে হাফি হাবিলদারের একটা বাক্য সবাইকে স্তব্ধ করে দেয়। মনে করিয়ে দেয় অতীতের সেই গন্ধ কালীর স্বরূপকে, "মেয়েটার জেদ দেখুন, ঠিক যেন গন্ধকালী; হাফি হাবিলদার বাঁ পাশের সিট থেকে বলল। হাফি হাবিলদার গ্যালারিতে উঠে দাঁড়ালো। বিমলার দিকে তাকিয়ে মাটিতে দু-পা ঠুকে বুক টানটান করে স্যালুট দিল।"[৬]

পুরো উপন্যাসে এই একমাত্র মানুষ যে গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেয় প্রতি ক্ষণে। সে হাফি হাবিলদার। অসম্ভব বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। সর্বক্ষণ যে-কোনো পরিস্থিতিতে সে পাশে থেকেছে যোজনগন্ধার। দুই সময়ের সাক্ষ্য বহন করছে এই মানুষটি। যোজনগন্ধা চৌথূপীতে আসার পর থেকে তার বিদায় গ্রহণ পর্যন্ত, এমনকি যোজনগন্ধার পরবর্তী জীবনেও বন্ধু হয়ে পাশে থেকে গেছে। মাঝের কয়েকটি দিনে একমাত্র সম্বল ছিল দু'জন দু'জনের। নানা ঘটনার সাক্ষী থেকেছে এবং বুদ্ধিদীপ্ততার সঙ্গো প্রাচীন দুর্মূল্য জিনিসকে বিদেশে পাচারের হাত থেকে দেশের সম্পদকে রক্ষা করেছে।

রোমাঞ্চের পাশাপাশি এক নতুন সৃষ্টির গল্প 'চৌথূপীর চর্যাপদ'। চর্যাপদ যে জীবনের গান তা প্রমাণ দিল এই উপন্যাসের কাহিনি গ্রন্থন। একদিকে গন্ধকালীর আগুন পাখি কেন তার জীবন ইতিহাস খোঁজা অন্যদিকে বিমলা নাম্নী এক নারীর জীবনকে অসৎ থেকে সৎ পথে ফিরিয়ে এনে সমাজে উঁচু স্তরে তার প্রতিভাকে তুলে ধরতে কঠিন লড়াই জয় করেছে। যোজনগন্ধার বাবাও সেই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি অসফল হয়ে জীবনের পরপারে মৃত্যুকে বরণ করে নেন। মেয়ের সফলতাই হয়তো বাবাও পরলোকে আনন্দ উদ্‌যাপনে মাতেন। বিমলাকে প্রতিষ্ঠা করা এবং গন্ধকালীর ইতিহাস জানা যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ।

তথ্যসূত্র:

১। 'চৌথূপীর চর্যাপদ', প্রীতম বসু; নিউ ইয়র্ক, ২০১৭, পৃ. ১০
২। 'চর্যাপদ', মণীন্দ্রমোহন বসু, কলকাতা, বামা পুস্তকালয়, মুদ্রণ ২০১২, পৃ. ৫৭
৩। 'চৌথূপীর চর্যাপদ', প্রীতম বসু, নিউ ইয়র্ক, ২০১৭, পৃ. ৬২
৪। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', জীবনানন্দ দাশ, বুকসওয়ে পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ২৫
৫। 'চৌথূপীর চর্যাপদ', প্রীতম বসু, নিউ ইয়র্ক, ২০১৭, পৃ. ১৭৪
৬। ওই, পৃ. ৪৪২

—